OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 43*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 352 - 363*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 352 - 363*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848*

# নন্দিনী : ঘুমভাঙানিয়া

ড. সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কুলতলী ড. বি. আর আম্বেদকর কলেজ
Email ID : dr.sujatabanerjee27@gmail.com

***Received Date*** *25. 06. 2025*
***Selection Date*** *20. 07. 2025*

***Keyword***
*Chemistry of Relationship, atmosphere, truth, era, mechanical discipline, mysterious, Raktakarabi.*

***Abstract***
*Raktakarabi is the drama that Rabindranath rewrote many times. Along with that, the name of the drama have been changed into the name of the heroine several times. Nandini is the lifeblood of this drama. Kishor, Bishu, Raja and Ranjan are all in love with her. The chemistry of her relationship with the professor is also mysterious. It is good to say that she has impressed the entire Yakshapuri. Of course, leader and chief are different. There is a lot of doubt in everyone's mind about why Nandini was brought to Yokeshapuri. She adoms herself in the guise of Raktakarabi. She just shows off her beauty around all the time and waits for Ranjan. She is not at all afraid of Makar Raja of Yakshapuri. Rather indulges. Nandini has absolutely no fear. She believes in Ranjan's hymn. In Yokshapuri, she has brought about a completely different atmosphere. But not only does she indulge the king, but the king also indulges her. Is it because the king feels helpless to go against his system? Can't look at the image of wanting to leave reign of terror created so far? The truth is mysterious why Nandini was brought by the king. When Ranjan died, Nandini ran with the king to break the prison. She was followed by Nandini's followers at Yakshapuri. Nandini was able to being in a new era by breaking the mechanical discipline in Yakshapuri.*

## Discussion

বর্তমানে 'রক্তকরবী' বলে যে নাটকটি পাঠ করে থাকি প্রথমে তার নাম ছিল 'যক্ষপুরী'। তারপর পাণ্ডুলিপিতেই তার নাম পরিবর্তন করে নাট্যকার নাম রাখেন 'নন্দিনী', আর শেষে এর নাম হয় 'রক্তকরবী'। নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রক্তকরবী ফুলের বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তবে একথা সকলেই বুঝতে পারবেন যে 'নন্দিনী'র সঙ্গে 'রক্তকরবী' ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। নন্দিনীর আভরণ রক্তকরবী। কাজেই কখন যেন নন্দিনীর আচরণের সঙ্গে এমনকি তার উপস্থিতির সঙ্গেও রক্তকরবী সমার্থক হয়ে গেছে। 'নন্দিনী' নামক মানুষীটিকে বুঝতে গেলে রক্তকরবীর মায়াটিকেও বুঝে নিতে হবে। নাট্যকার যে ব্যঞ্জনাটিকে বিস্তার দিতে চেয়েছিলেন তাকে প্রতিষ্ঠা দিতেই 'নন্দিনী' নামটি পরিহার করে

'রক্তকরবী' নামকরণকে গ্রহণ করেছিলেন। 'নন্দিনী' বললে যে সাধারণ মানুষটি বোঝায়, নাটকের এই প্রধান প্রাণ ভোমরাটি যে অতটা সাধারণ নয় তা তো বলাই বাহুল্য। আর সেই ইঙ্গিতটুকুই আভাসিত হয়ে আছে 'রক্তকরবী'র মধ্যে। নাটকটির প্রস্তাবনায় রবীন্দ্রনাথ যতটা সহজতার সঙ্গে লিখেছেন — "এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি," — নাটকটি যত এগোয় ততই বোঝা যায় এই মানবীটি কি যেন এক জাদুকরী ক্ষমতার অধিকারী। সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার ক্ষমতা তার আয়ত্তে। এই আলোচনায় সেই অদ্ভুত ক্ষমতাধারী মানবী চরিত্রটিকে বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

'রক্তকরবী' নাটকটির বহুমাত্রিকতা একে সাধারণের কাছে যেমন দুরূহ করে তুলেছে তেমনি করে তুলেছে আকর্ষণীয়। বিভিন্ন পরতে পরতে নাটকটি রসিক নাট্যপ্রেমী পাঠকের মনোজগতকে চুম্বকের মতোই আকর্ষণ করে রাখে। তবে সাধারণভাবে কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবীর চিরকালীন দ্বন্দ্বের বিষয়টি ছাড়া আর যে বিষয়টি পাঠকের নজর প্রথমেই পড়ে তা হল 'প্রেম'। রবীন্দ্রনাথ নাটকটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই যা বলেছেন তা হল – 'নাটকটি সত্যমূলক'। আমরা আর একধাপ এগিয়ে বলতে পারি নাটকটি 'প্রেমমূলক'।

'নন্দিনী' সেই অদ্ভুত রহস্যময়ী নারী যার সঙ্গে এই নাটকের বহু পুরুষেরই প্রেম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, এবং খেয়াল করার মত বিষয় এই পুরুষেরা বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন স্তরে তাদের অবস্থান। কিশোর, বিশু, রঞ্জন, রাজা, অধ্যাপক – এই পাঁচজনের সঙ্গে প্রেমসম্পর্ক তার সরাসরি। যদিও এই পাঁচজনের সঙ্গে সম্পর্কের তারতম্য আছে — তবে তা অবশ্যই প্রেমের, একে অস্বীকার করবার কোনো জায়গা নেই। কিন্তু শুধু এরাই নয়। নন্দিনীর প্রতি মুগ্ধতা বোধে আক্রান্ত যক্ষপুরীর অনেক পুরুষই। অনেকেই নন্দিনীর প্রতি মুগ্ধতা বা আকর্ষণ স্বীকার করতেও অস্বস্তি বোধ করে। স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে 'নন্দিনী' তাহলে ঠিক কেমন নারী? যার এতগুলো পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক? এই সবাইকে নিজের রহস্যে, মায়ায়, জাদুতে সে কেমন করে, কোন উদ্দেশ্যে আটকে রাখতে চায়? যক্ষপুরীর সাধারণ রমণীরা তাকে বলে সে নাকি 'ভয়ঙ্কর'? সবার ওপর এই যে তার প্রভাব, এই যে তার প্রতিপত্তি কেমন করে সে রক্ষা করে চলে? এই সমস্ত কিছুই নন্দিনীকে আরো বেশি করে রহস্যময়ী চরিত্রে উন্নীত করে না কি?

আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আরো একটি কথা, নাটকটির দশটি খসড়া করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথমে এটির নাম ছিল 'যক্ষপুরী' সে কথা আগেই উল্লেখিত। নাটকটির প্রথম খসড়ায় নন্দিনীর নাম ছিল 'খঞ্জনী' কখনো ডাকা হয়েছে 'খঞ্জন' বলে। দ্বিতীয় খসড়াতে আসে 'নন্দিনী' নামটি। যদিও 'খঞ্জনী' নামটিও একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে এমনকি দুবার 'সুনন্দা' নামও নাট্যকার উল্লেখ করেছেন। আবার 'নন্দিনী'কেও ডাকা হয়েছে 'নন্দিন' নামে। অর্থাৎ এই 'রক্তকরবী নাটকের নাম ও নায়িকার নাম বেশ কয়েকবার বদল হয়েছে –

> "একথা আমাদের জানা যে 'রক্তকরবী' প্রথম খসড়া যখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, তখন 'নন্দিনী' নামের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। ছিল না রক্তকরবী ফুলটির অস্তিত্বও। প্রথম খসড়ায় নায়িকার নাম ছিল খঞ্জনী। দ্বিতীয় খসড়া লেখার সময়ও খঞ্জনী নামটি ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় খসড়াটি মার্জনার সময় রবীন্দ্রনাথ যে কোনো কারণেই হোক ওই নায়িকা-নামটি পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। মাত্র দুবারের জন্য হলেও 'খঞ্জনী'র পরিবর্তে 'সুনন্দা' নামটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন (প্রথমবার 'নাট্যপরিচয়'-এ নায়িকা নামে। দ্বিতীয়বার নাটকের প্রথম সংলাপ নির্দেশক চরিত্রের নামে)। কিন্তু এই পর্যন্তই। এরপর দ্বিতীয় খসড়ার মার্জনা কালেই ওই দুটি নামের পরিবর্তে এল 'নন্দিনী' নামটি। শুধু নায়িকা চরিত্রের নাম হিসেবেই নয়, যেন ধীরে ধীরে যক্ষপুরীর আবহ থেকে সরে নাটকের প্রাণকেন্দ্রে স্থাপন করা হল ওই নন্দিনীকে। ক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম খসড়ার শিরোনাম হিসেবেও উঠে এল ওই 'নন্দিনী' নামটি। কী জাদু ছিল ওই নামে? কীসের প্রেরণা ছিল।"[১]

পরবর্তীকালে আমরা লক্ষ করলাম বারবার খসড়া বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকারের নাট্যভাবনাটিরও পরিবর্তন ঘটেছে। 'নন্দিনী' নামটি যেমন নায়িকা হিসেবে স্থায়িত্ব পেল তেমনই রক্তকরবী ফুলটিও বিশেষ গুরুত্ব পেল। সে যেন একই সঙ্গে হয়ে উঠল প্রেম ও প্রতিবাদের চিহ্ন। সে ফুল আবার রঞ্জনের প্রিয়। রঞ্জনকে মনে করে সেই ফুল নন্দিনী কানে, গলায়, হাতে আভরণ করেছে — এইভাবে রঞ্জনের স্পর্ধা ও প্রেমের, এমনকি প্রতিবাদেরও, প্রতীক হয়ে উঠেছে রক্তকরবী। আর তাই 'নন্দিনী' নাটকের নামকরণ হলে যতটা না গভীরতা বা ব্যঞ্জনা পেত তার থেকে বহুগুণ অর্থবহুল হয়ে উঠল 'রক্তকরবী' নামকরণটি —

> " 'নন্দিনী' নাম হলে তার ঝোঁকটা পড়তো চরিত্রের ওপরে। কিন্তু নন্দিনী কেন? নন্দিনী কিসের প্রতিনিধিত্ব করছে এই নাটকে? সে প্রেম ও প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি। আর এই দুটি বিষয়ই যদি কোনও প্রতীকে ধরা দিয়ে থাকে, এই নাটকে, তাহলে সেই প্রতীক নিঃসন্দেহে রক্তকরবী ফুল। যে নাটকে রূপক ও সংকেতের অধিকার রয়েছে, সেই নাটকের নামের মধ্যেও ইঙ্গিতময়তাটুকু কবি-নাট্যকার যে রেখে দিতে চাইবেন, সেটাই স্বাভাবিক। রক্তকরবী ফুল নন্দিনীর প্রিয়। কেননা সেই ফুল তার প্রিয়তম রঞ্জনের পছন্দের ফুল। ...নাটকের শেষে নন্দিনীর হাত থেকে খসে পড়া রক্তকরবীর কঙ্কন বিশু নিজের হাতে তুলে নেয়। তুলে নিয়ে এগিয়ে যায় সংগ্রামের পথে। তখন এই ফুলটিই হয়ে দাঁড়ায় প্রতিবাদ-প্রতিরোধের অভিজ্ঞান।"[২]

আসলে 'নন্দিনী' চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে রক্তকরবীর ব্যঞ্জনাটি। নন্দিনী চরিত্রটিকে বুঝতে হলে তাই 'রক্তকরবী'র ভিতরের অর্থটিকেও হৃদয়ঙ্গম করা দরকার।

আমরা আবার ফিরে যাব আলোচনার শুরুতে যেখানে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন স্তরের পুরুষের সঙ্গে নন্দিনীর প্রেমসম্পর্কের কথা বলা হয়েছিল। এই রক্তকরবী নাটকটি শুরুই হয়েছে কিশোরের ডাকের মধ্যে দিয়ে। এখানে নাট্যকার উল্লেখ করে দিয়েছেন কিশোরের প্রবেশের আগে যে সে নন্দিনীকে ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করে মঞ্চে। খুবই সহজভাবে তার আগমন, যদিও কথাবার্তা যতই এগোয় ততই বোঝা যায় যে কথা সে বলছে তা মোটেও ততটা সহজ নয়। ছেলেমানুষের কথা বলে তাকে মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। প্রথমেই যেটা কানে লাগে নন্দিনীকে নাম ধরে ডাকার বিষয়টি। বয়সে অনেকটাই বড় নন্দিনী, তবু যখন তাকে কিশোর নাম ধরে ডাকে, আর কেন এত করে সে ডাকে নন্দিনীর এই জিজ্ঞাসায় সে অত্যন্ত সরলতার সঙ্গে বলে যে "আমার যে ডাকতে ভালো লাগে।" — তখনই আমাদের একটু হলেও চমক লাগে বইকি। কেননা বয়সে বড় একটি তরুণীকে ডাকতে ভালো লাগে বলেই যখন কেউ শুধু শুধুই তার নাম ধরে ডাকে তখন বুঝতে হবে সেই ভালো লাগাটা একটু বিশেষ রকম ভালো লাগা। তবে তারই সঙ্গে ছেলেমানুষীটাও যে মিশে আছে বোঝা যায় যখন কিশোর একই সঙ্গে বলে – "আর ফুল চাই তোমার? তা হলে আনতে যাই।" — বোঝা যায় নন্দিনী রক্তকরবীর খোঁজ করেছিল বলে কিশোর তা এনে দিয়েছে, আর নন্দিনী আরো ফুল পেলে আরো খুশি হবে এই প্রত্যাশায় সে সঙ্গে সঙ্গেই আরো ফুল এনে দেবার কথা বলেছে। এখানে যেন কিশোরের উত্তেজনাকে ছুঁতে পারা যাচ্ছে। একটা গোপন অধিকারের আনন্দে যেন তীব্র উত্তেজনাকে কোন মতে দমন করে আছে। সে নন্দিনীকে সেই ফুল এনে দিতে পারবে এই সম্ভাবনাও মিশে আছে এই উত্তেজনার মধ্যে। এসব কিছুই বোঝা যায় পরবর্তী কথোপকথনের মাধ্যমে।

"তুমি যে বলেছিলে, রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই।" — নন্দিনী যে জিনিসটি চেয়েছে অনেক খুঁজে সেই একটি মাত্র গাছ সে পেয়েছে এই যক্ষপুরীতে, কাজেই বিশেষ ভালবাসার মানুষটিকে সেই ফুল এনে দিতে পারার আনন্দে সে যেন ডগমগ করছে। নন্দিনী যখন তাকে বলে গাছটি দেখিয়ে দিতে সেখান থেকে সে নিজে তুলে নিয়ে আসবে তখন যে অভিমান ধরা পড়ে কিশোরের গলায় তা গভীর প্রেম ছাড়া সম্ভব নয়। তবে প্রেমের তো বিভিন্ন পরত থাকে। থাকে মুগ্ধতাবোধ। সব প্রেমের সমীকরণ একরকম হয় না। বয়ঃসন্ধিকালের বালকদের একধরনের মুগ্ধতাবোধ কাজ করে তার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 352 - 363
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থেকে বড় নারীদের প্রতি, একধরনের তীব্র আকর্ষণও থাকে। নন্দিনীও কিশোরকে প্রশ্রয় কম দেয় না। যদিও নন্দিনীর ঘোষিত প্রিয়তম পুরুষটি রঞ্জন; তবে কিশোরের সঙ্গে তার যে স্নেহ মিশ্রিত এক অন্যধরনের প্রশ্রয় কাজ করে তা নাটক যত এগিয়েছে ততই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে ওঠে। নন্দিনী নিজে ফুল আনবার কথা বলতে কিশোর যা বলে, যেভাবে বলে, তা বুঝিয়ে দেয় কিশোর নন্দিনীর প্রতি কোন অনুভব মনে মনে পোষণ করে। "নন্দিনী, নিষ্ঠুর হয়ো না। ঐ গাছটি থাক আমার একটিমাত্র গোপন কথার মতো। বিশু তোমাকে গান শোনায়। সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাব, এ আমারই নিজের ফুল।" ভালবাসা একধরনের অধিকার বোধের জন্ম দেয়, আর দেয় ঈর্ষা। স্পষ্টতই এখানে বিশুর সঙ্গে কিশোর নিজের তুলনা করে ফেলেছে, হয়তো এই তুলনা সে করে ফেলেছে অজান্তেই। কিন্তু একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে বিশু যেহেতু বয়সে নন্দিনীর কাছাকাছি, তাই তার সঙ্গে নন্দিনীর সম্পর্ক অনেক পরিণত। আর গান শোনাবার সুবাদে সে নন্দিনীকে খুশি করতে পারে বা তার সঙ্গে সময় কাটাতেও পারে বেশি। নন্দিনী বিশুর সঙ্গে যে ভাষায় বা ভাবে কথা বলে কিশোরের সঙ্গে তা বলে না। কিশোর জানে যে তার বয়স কম বলে নন্দিনী তাকে ঠিক তার সমগোত্রীয় ভাবে না। যে জায়গাটা বিশু পায় নন্দিনীর কাছে সেই জায়গাটা কিশোর পায় না। এখন কিশোর কীভাবে সেই জায়গায় পৌঁছবে। তার যে বয়স কম। এটা তো সে বদলাতে পারবে না। আর তাই সে প্রাণপণে তার কাজ দিয়ে চায় নন্দিনীকে খুশি করতে। আর এই রোমান্টিসিজিমের চরমে উঠে সে নন্দিনীকে জানায় — "একদিন তোর জন্য প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে মনে ভাবি।" — নাটকের শুরুতে যে কথা চরম রোমান্টিসিজমের, প্রকাশ বলে মনে হয়, নাট্যকার নাটকের একেবারে শেষ পর্যায়ে তাকেই চূড়ান্ত সত্য ঘটনায় পর্যবসিত করবেন। তার আগে অনেক ঘটনার ঘনঘটা রয়েছে। আমরা সেই ঘটনা প্রবাহকে বুঝে নিতে নিতে এগোব পরিণতির দিকে।

> "কৈশোর এমন একটা বয়স যেটাকে বলা হয় বয়ঃসন্ধিকাল। যখন নিজের শরীরের মধ্যে কিছু পরিবর্তন অনুভব করে বলেই বোধহয় তার মনটা অতো তীব্রভাবে পবিত্রতার দিকে, আত্মিক অনুভবের দিকে ঝোঁকে। ...এ সেই বয়স যখন দেশের ভালোর জন্যে, সমাজের ভালোর জন্যে, মহৎ একটা আদর্শের জন্যে, প্রাণটাকে বলি দিতে যেন কেবলই ইচ্ছে করে।"[৩]

আর সেই তীব্র আবেগ থেকে, একটা বিশেষ কিছু নন্দিনীর জন্য কের তাকে তাক লাগিয়ে দেবার প্রচেষ্টা থেকেই কিশোর এক অবুঝ জেদের বশবর্তী হয়ে বলে ওঠে – "...ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব।" নন্দিনীর কাছে প্রেমের অভিজ্ঞান রক্তকরবী ফুল, পরে ধীরে ধীরে যা হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের ও স্পর্ধারও অভিজ্ঞান, সেই রক্তকরবী ফুল এনে দেবার দায়িত্ব পায় কিশোর। এই রক্তকরবী ফুল আমরা নাটকের শেষদৃশ্যেও দেখব। দেখব কি অদ্ভুতভাবে সেই রক্তকরবী ফুল যা কিশোর এনে দিত, তাই অভিজ্ঞান হয়ে উঠে যাচ্ছে বিশুর হাতে, নন্দিনীর হাত ঘুরে এসে তখন তা হয়ে উঠছে প্রতিবাদের প্রতীকস্বরূপ। নন্দিনী তার সমস্ত প্রেম সম্পর্ককে কী কৌশলে ন গেঁথে ফেলেছে রক্তকরবীর ফুলের গাঁথনিতে।

কিশোরের পরে নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বিশু। নন্দিনীর সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রেও বিশুর গুরুত্ব রঞ্জনের পরেই। রঞ্জনকে নাটকে সরাসরি দেখা যায় না। বিশুকে দেখা যায়। এছাড়া কিশোরের কথাতেই আমরা আগেভাগে জেনে যাই বিশু নন্দিনীকে গান শোনায়, যা তার নিজের গান, বোঝা যায় নন্দিনীর সঙ্গে বিশুর প্রেম বেশ পরিণত। নাটক এগোলে বোঝা যায় শুধু পরিণত প্রেম নয়, বেশ জটিলও বটে। যদিও নন্দিনীর সঙ্গে বিশুর কথোপকথন এতই সহজ ও সাবলীল যে আমাদের সহজ বুদ্ধিতে কথাগুলির মর্মে প্রবেশ করতে গেলে ধাঁধাঁ লেগে যায়। নন্দিনী এবং বিশু সামনাসামনি আসে বেশ অনেকখানি নাটক এগিয়ে যাবার পর। কিন্তু খেয়াল করার ব্যাপার এটাই যে তার আগেই বিশুর সঙ্গে যক্ষপুরীর অন্যান্য বাসিন্দাদের কথাবার্তার সুবাদে মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যায় যে নন্দিনীর সঙ্গে বিশুর সম্পর্ক বেশ গভীর। ফাগুলালের স্ত্রী চন্দ্রার উক্তি সেক্ষেত্রে একেবারে যথার্থই বলে মনে হয় — "ওকে নন্দিনীতে পেয়েছে।" ...প্রথমটা শুনতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 352 - 363
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যেন কেমন কেমন মনে হলেও এই কথাটি যে শুধু বিশুর জন্য নয়, কিশোর এমনকি রাজার জন্যও — যে রাজাকে লোকে আড়ালে তার ভয়াবহতার জন্য মকর রাজ বলে ডাকে যেন তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য — তা উপলব্ধি করা যায় নাট্যপরিণতির দিকে তাকালে।

চন্দ্রা নিজে একজন নারী বলেই মেয়েদের স্বভাবজ ঈর্ষা, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রখরতার জন্য অনুভব করতে পারে নন্দিনীর প্রতি যক্ষপুরীর পুরুষদের এই মুগ্ধতাকে। বিশুর ক্ষেত্রে তো বটেই এমনকি তার স্বামী ফাগুলালও যে নন্দিনীর প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত, এবং শুধুমাত্র তার চোখরাঙানির ভয়ে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করতে সাহস পায় না সেটা সে ভালভাবেই জানে। তাই ঠাট্টার ছলে সে ফাগুলালকে সাবধান করে বলে যে — "ওগো সাবধানে থেকো। কোনদিন তোমারও গলা থেকে গান বের করবে — সেদিন পাড়ার লোকের কী দশা হবে! মায়াবিনী মায়া জানে। বিপদ ঘটাবে।"

কাজেই সেই মায়াবিনী নন্দিনীর কাছ থেকে চন্দ্রা যেমন ফাগুলালকে সাবধান করে তেমনই সাবধান করে বিশুকেও, বলে — "তরী ডোবাবে একদিন বলে দিলুম, তোমার সেই সাধের নন্দিনী।"

ফাগুলালের কথা থেকে জানতে পারা যায় — "এখানে আসবার অনেক আগে থাকতেই ও নন্দিনীকে জানে।" পরে নন্দিনীর সঙ্গে বিশুর কথোপকথনের সূত্রে সেই জানাটা যে কতটা গভীর ছিল সেটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রামে থাকতে বিশু ও রঞ্জন দুজনেই ছিল নন্দিনীর প্রণয়প্রার্থী। কিন্তু বিশু রঞ্জনের সঙ্গে কোনো প্রতিযোগিতায় যেতে চায়নি। নন্দিনীর প্রতি ভালবাসা বুকে নিয়ে নীরবে সরে গিয়েছিল। নন্দিনী যে জানতো না বিশুর প্রতি তার মনোভাব তা কিন্তু নয়, আসলে রঞ্জনের ভালবাসার যে জোর সেই জোরকে, সেই মাতাল করা জোর বা দামালপনাকে সে অস্বীকার করতে পারে নি। আর বিশু সেই প্রতিযোগিতার ময়দান ছেড়ে চলে এসে নন্দিনীর দ্বিধার জায়গাটা রাখতে চায়নি। নন্দিনীর সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধাই করে দিয়েছে সে একপ্রকার। অথবা বলা ভাল রঞ্জনকে নিষ্কন্টকভাবে জিতিয়ে দিয়েছে বিশুই। নন্দিনীর সংলাপ থেকেই জানতে পারা যায় যে "দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয় ... প্রাণ দিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হার-জিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে। একদিন তুমিও তো তার মধ্যে ছিলে। কিন্তু কী মনে করে বাজি খেলার ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গেলে। যাবার সময় কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারলুম না – তার পরে কতকাল খোঁজ পাইনি। কোথায় তুমি গেলে বলো তো।" – 'এই যে কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে।' কিংবা — 'একদিন তুমিও তার মধ্যে ছিলে' — এই কথাগুলি থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে নন্দিনী জানত যে বিশুও তাকে কতটা চায়। কিন্তু নারীর সহজাত প্রবৃত্তি হল বহু পুরুষের ভালবাসা সে উপভোগ করে। নন্দিনীও তার ব্যতিক্রম নয়।

> "বিশু পাগলের সঙ্গে নন্দিনীর সম্পর্ক প্রেমেরই। যাকে তারা বন্ধুত্বের আচ্ছাদনে মুড়ে রেখেছে। রঞ্জন (অন্তত নাটকের মধ্যে) নন্দিনীর কাছে এক বিস্ময়, সুখ ভরা স্বপ্ন। যাকে পাওয়ার আগে সে চিনেছে, না পেয়েও ভাব সম্মিলনে আপ্লুতা হয়েছে। কিন্তু বিশু তার কাছে প্রত্যক্ষ, সত্য বাস্তব। কোনোভাবেই এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।"[৪]

বরঞ্চ যক্ষপুরীতে দেখা গেছে নন্দিনী কি এক বিশেষ গূহ্য কারণে তার প্রতি পুরুষদের মুগ্ধতাকে বেশ কৌশলেই ব্যবহার করেছে। চন্দ্রার ঈর্ষাজনিত মন্তব্য — যে সবার ওপরেই নন্দিনীর হাওয়া লেগেছে তা যে অকারণ নয়, অসচেতন ভাবে তো নয়ই, নন্দিনী তার হাওয়া যে সবাইকার ওপর লাগতে দিয়েছে বলেই লেগেছে তা বলাই বাহুল্য। বিশুকে আবার অনেকদিন বাদে যক্ষপুরীতে দেখে নন্দিনীর আনন্দ আর ধরে না। অজানা অচেনা পরিবেশে পরিচিত কারো দেখা পেলে অবশ্যই আনন্দ হবে তাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে তো নন্দিনী জানতই যে বিশু তাকে কী চোখে দেখে। তবু যখন নন্দিনী বিশুকে বলে — "তোমাকে একটা কথা বলি পাগল! যে দুঃখটির গান তুমি গাও আগে তার খবর পাই নি" — তখন একটা খটকা তো লাগেই। কেন তার খবর পায় নি নন্দিনী! সে তো বেশ ভাল করেই জানত যে বিশু তাকেই ভালোবাসে। তার মনের গতি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 352 - 363
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রঞ্জনের প্রতি একটু বেশি তা বুঝে সে সরে গেছে। তবে এই কথা সে বলল কেন? হতে পারে বিশুর হৃদয়ে সে ঠিক কতখানি জায়গা জুড়ে আছে সেটা সে বোঝেনি। এও হতে পারে আজ রাজা যখন তাকে যক্ষপুরীতে নিয়ে এসেছে, রঞ্জনের কাছ থেকে সরে এসে, বিশুকে এত কাছ থেকে দেখে সে উপলব্ধি করতে পারছে রঞ্জনের আছে আনন্দের জোর, আর বিশুর আছে দুঃখের জোর। আর সেই কারণেই বিশু হয়ে উঠেছে তার প্রাকার, যাতে উঠে সে বাইরের আকাশকে দেখতে পায়, বিশুকে সে ডাকে 'পাগল' বলে। এও তো ভালবাসারই ডাক। বিশু যে নন্দিনীর প্রতি পাগল। আর বিশুর কাছে নন্দিনী 'দুখজাগানিয়া', 'সমুদ্রের অগম পারের দূতী'। নন্দিনীর হৃদয়ের সঠিক বার্তা তাই বিশুর কাছেই স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। নন্দিনী যক্ষপুরীতে রঞ্জনের দূত। রঞ্জন যা করতে চেয়েছে সেই কাজ নন্দিনীকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে সে সামনে না থেকেও। রঞ্জনের আরব্ধ কাজের ধারক বাহক নন্দিনী। আর সেই কাজে নন্দিনীর পাশে থেকে তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য যে করে চলেছে সেই বিশু। কাজেই রাজাকে যখন সে বলে, — 'আমি রঞ্জনের ও পিঠ, যে পিঠে আলো পড়ে না — আমি অমাবস্যা'। তখন বোঝা যায় যে রঞ্জন আর বিশু দুজন মিলেই পূর্ণ। উদ্দেশ্য সাধনে তাই রঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিশুকেও অবশ্যই দরকার। বিশু আগাগোড়া তাই নন্দিনীকে সঙ্গ দিয়েছে। পাশে থেকেছে। এমন কি নাটকের শেষে যখন নন্দিনী রাজার সঙ্গে এগিয়ে গেছে সর্বস্ব পণ করে সর্বনাশের দিকে, সিস্টেমের বিরুদ্ধে মহাযাত্রায় তখন বিশুই একমাত্র ব্যক্তি যে রক্তকরবীর কঙ্কণ কুড়িয়ে নিয়ে বাকি সবাইকে একজোট করে নন্দিনীর যাত্রাপথের পথিক হতে পেরেছে। বিশুর সঙ্গে নন্দিনীর কথোপকথনে জানা গেছে ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে মোটেই সুখের সংসার তার হয় নি। সেই নারী সোনা ও আভিজাত্যের লোভে বিশুকে মর্যাদা দিতে পারে নি। আর যার চোখে নন্দিনীর প্রেমাঞ্জন লেগেছে সে অন্য যে কোনো নারীর প্রতি অনুরক্ত হতেও পারবে না।

> "ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতা ও আত্মমগ্নতার জগৎ থেকে এই নাটকে বিশুর উত্তরণ ঘটেছে নন্দিনীর সাহচর্যে। সংখ্যা সর্বস্ব পরিচয়ে খোদাইকর বিশুই পরবর্তী পর্যায়ে খোদাইকরদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেবে। ...নন্দিনী তার বিপদ সামলে চলার ভয় থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে। সর্দারদের হাতে বন্দি বিশু তাই নিজের বন্দিত্বকে মুক্তির সঙ্গে তুলনা করেছে।"[৫]

বিশুর এই পরিণতি নন্দিনীকে আহত করেছে। নাটকের একেবারে শেষের দিকে তাই তার উপলব্ধি "মিলনে আমার আর সুখ হবে না। একথা কোনোদিন ভুলতে পারব না যে, তোমাকে শূন্য হাতে বিদায় দিয়েছি। আর, ঐ যে বালক কিশোর, ও আমার কাছ থেকে কী বা পেলে!" এই আত্মগ্লানি, এই স্বীকারোক্তি বুঝিয়ে দেয় বিশু তো বটেই কিশোরও যে তার প্রতি অনুরক্ত একথা সে জানত। যখন এই সর্বনাশের খেলায় সে নেমেছিল তখন হয়তো এই পরিণতির কথা সে ভাবেনি। ভয়ানককে সামনে দেখে, বিশু ও কিশোরের প্রাণ যখন বিপন্নতাকে স্পর্শ করতে চলেছে তখন সে বুঝতে পারছে যে কি সর্বনাশকে সে আহ্বান করেছে।

এই সর্বনাশের খেলায় শেষ পর্যন্ত সে সামিল করতে পেরেছে অধ্যাপককেও। সেই অধ্যাপক যে কিনা পুঁথিপত্রের মধ্যেই নিজের আলাদা জগৎ করে নিয়েছে। মাঝে মাঝে সেখান থেকে বের হয়। বেগতিক বুঝলেই আবার সেখানে গিয়ে ঢুকে পড়ে। সেই অধ্যাপক যাকে নাট্যকার তার পেশাগত বৃত্তিকেই নাম করেছেন। আলাদা নাম দেননি। এরকম বেশ কজন আছে রক্তকরবী নাটকে। রাজা, গোঁসাই, সর্দার, মোড়ল ইত্যাদি। এ থেকে বোঝা যায় এই চরিত্রেরা তাদের এই কাজ বা পদের বাইরে ব্যক্তিচরিত্র হিসাবে বের হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। নন্দিনীর সঙ্গে অধ্যাপকের সম্পর্কটি বড়ই অদ্ভুত। অধ্যাপক বারবার নন্দিনীর সঙ্গ চায়। আর নন্দিনী একমাত্র তাকেই বোধহয় এড়িয়ে চলতে চায়। চায় কথার জালে না জড়িয়ে পিছলে যেতে। তবে একথাও ঠিক তারই মধ্যে একটা আলগা রহস্যের, আকর্ষণের জাল সে ছড়িয়ে রাখে। সে অধ্যাপকের মনকে নাড়া দিয়ে যায় শুধু সাড়া দিতে চায় না। বোধহয় নন্দিনী প্রথম থেকেই বুঝতে পেরে যায় কিশোর, বিশু যে অর্থে যেভাবে সর্বস্ব খুইয়ে, সর্বস্ব উজাড় করে তার জন্য পথে নামতে পারবে, প্রাণ বাজি রাখতে পারবে, অধ্যাপক

তার নিজের পদমর্যাদার ঘেরাটোপ থেকে অত সহজে পথে নামতে পারবে না। তাই অন্যান্যদের সঙ্গে তার যে আচরণ অধ্যাপকের সঙ্গে সেই ট্রিটমেন্টটা একেবারে আলাদা। এখানে আবার চন্দ্রার একটি উক্তি বিশেষ স্মরণযোগ্য — "একটা কথা বুঝি যে, যে মেয়েকে তোমরা যত কম বোঝ সেই তোমাদের তত বেশি টানে।" আর অধ্যাপক নন্দিনীকে তার পুঁথি পড়া বিদ্যায় বুঝতে পারে না বলেই নন্দিনীকে নিয়ে তার বিস্ময়ের শেষ নেই। নন্দিনীর জিজ্ঞাসার উত্তরে তাই সে বলে — "সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই। কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো।" যখনি অধ্যাপক নন্দিনীকে ডেকেছে, বুঝতে চেয়েছে তখনি নন্দিনী তাকে উত্তর দিয়েছে একটু বাঁকাভাবে। এইভাবে হয়তো নন্দিনী অধ্যাপকের চারপাশের বিদ্যের তৈরি করে তোলা মিথ্যা অহমিকাকে, জমাট আবরণটিকে ভাঙতে চেয়েছে। এও একধরনের আকর্ষণ বিকর্ষণের খেলা। তাই অধ্যাপক তাকে তত্ত্বকথা বোঝাতে ডাকলে নন্দিনী তার আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলতে ছাড়ে না — "তোমাদের খোদাইকর যেমন খনি খুদে খুদে মাটির মধ্যে তলিয়ে চলেছে, তুমিও তো তেমনি দিনরাত পুঁথির মধ্য গর্ত খুড়েই চলেছো। আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে খরচ করবে কেন?" এই কথা বলার পরেও বেশ কিছুক্ষণ নন্দিনী কথা বলে অধ্যাপকের সঙ্গে। যে নন্দিনী সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছিল সেই নন্দিনী কিন্তু তারপর রঞ্জনের সঙ্গে তার ভালবাসার কথা বলে। বলে — "রঞ্জন আমাকে কখনো কখনো আদর করে বলে রক্তকরবী।" অধ্যাপককে সে এও জানায় আজ রঞ্জন আসবে তা সে জানতে পেরেছে। অধ্যাপর গম্ভীর, পণ্ডিত মানুষ। শুধু নন্দিনীর সঙ্গে কথাবলার সময় সে একটু হালকা কথা বলার চেষ্টা করে। আর নিজের চারপাশে যে মিথ্যা পাণ্ডিত্যের জালে সে ঢাকা পড়ে আছে তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতেও সে পারে এই নন্দিনীর সামনেই, এটাই নন্দিনীর জাদু। "জান নন্দিনী? — আমিও আছি একটা জালের পিছনে। মানুষের অনেকখানি বাদ গিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ংকর, আমিও তেমনি ভয়ংকর পণ্ডিত" — নিজের এতদিনকার সযত্নে লালিত ইমেজটাকে নিয়ে নির্মম ঠাট্টা করতে পারে অধ্যাপক নন্দিনীর কাছেই। উপলব্ধি করতে পারে তার মধ্যে — 'মানুষের অনেকখানি বাদ গেছে' – অর্থাৎ মানুষ হিসেবে যে সে অপূর্ণ থেকে গেছে এটা সে বুঝতে পারছে। নন্দিনী তার কাছে এখন এক রহস্য যাকে পুরো জানতে চাইবার সাহসও অধ্যাপকের নেই। নন্দিনী সেই সাহস, সে ভয় ভাঙিয়ে অধ্যাপককে প্রকৃত মানুষ হবার পাঠ দেয় অধ্যাপকেরই অজান্তে। আর সে কারণেই নাটকের শেষে পুঁথির ভার একপাশে নামিয়ে রেখে, পাণ্ডিত্যের ভার ফেলে রেখে বিদ্রোহের পথে সবার সঙ্গে সঙ্গী হতে পারে অধ্যাপক। এতো নন্দিনীকে ভালবাসারই ফল। নন্দিনী তার জাদুদণ্ডটি বুলিয়ে আত্মগরিমা সর্বস্ব অধ্যাপককে তার নিজের স্টাইলে মানুষ হয়ে ওঠার পাঠ দিয়েছে।'

রঞ্জন ছাড়া নন্দিনী আর যার প্রতি সব থেকে বেশি অভিনিবেশ দিয়েছে সে হল 'রাজা'। রক্তকরবী নাটকে যক্ষপুরীর এই রাজা 'মকররাজ' নামেও পরিচিত। সবার মুখে মুখে তার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল রাজার ভয়ঙ্কর, ভয়াবহ রূপ। রাজাকে দেখা যায় না মোটে। শুধু তার গলার স্বর শোনা যায়। নন্দিনীর রহস্যের মধ্যে রয়েছে নতুন কিছু খুঁজে পাবার আনন্দ। রয়েছে সজীবতা, প্রাণময় উচ্ছ্বাসের স্পর্শ। রাজাকে ঘিরে যে রহস্য তা ভয়ের আবরণ দিয়ে ঢাকা। বড়ই ভয়ংকর তার ইমেজ। সেই ভয়কে জিইয়ে রাখা হয় পরিকল্পনা করে, রাজার পারিষদবর্গ যেমন সর্দার, মোড়ল এরাই করে সেই সব কাজ। নাটকটি পড়তে পড়তে কেমন যেন মনে হয় — রাজাকে ঘিরে এই যে একটা বিরাট সিস্টেম চলছে, তার মধ্যে রাজা নিজেও অসহায় হয়ে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে। সেটা ভাঙার তার সাহস নেই, তার কোনো সঙ্গীও নেই। সে মধ্যাহ্ন সূর্যের মত একা। সবার মুখে মুখে চলে আসা কথা যে রাজা ভয়ানক। কিন্তু কী আশ্চর্যরকমভাবে নন্দিনীর প্রতি রাজা অনেক নরম। অনেক সহৃদয়। উল্টোটাও কি নয়! এই নাটকের যদি সত্যি কোনো রহস্য বা জটিলতা থেকে থাকে তা রাজা ও নন্দিনীর সম্পর্ক। কোনো মতেই রাজাকে প্রশ্রয় দেবার কথা না নন্দিনীর, কেননা তাকে রঞ্জনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে রাজা এই যক্ষপুরীতে। কেন নিয়ে এসেছে কেউ তা জানে না। নন্দিনী এখানে কোনো কাজ করে না। চন্দ্রার কথায় নন্দিনী - "অষ্টপ্রহর কেবল সুন্দরীপনা করে বেড়ায়।" নন্দিনীর এখানে আগমনের ফলে গুঞ্জন, কানাঘুষো কিছু কম নেই। গোকুল বলেছে "কিছুই করে না, তাই তো খটকা লাগে। এখানকার রাজা খামকা ওকে আনালে

কেন? ওর রকম সকম বুঝিনে।" – সত্যি তো, বেশ তো চলছিল যক্ষপুরীর খোদাইকরদের নিয়ে সর্দার মোড়লদের শাসন পরিচালনার কলকাঠি নাড়া। ক্ষমতার অপব্যবহার ও মনুষ্যত্বের অবমাননা। সোনার তাল তোলা, আর রাজার ভয় ধরানো উপস্থিতি — তাহলে এখানে নন্দিনীকে আনা হল কেন? এই কেন-র আড়ালেই লুকিয়ে আছে রক্তকরবী নাটকের আসল গুপ্ত রহস্য। নাট্যকার বলে রেখেছেন এই ঘটনা 'সত্যমূলক'। অনেকগুলি সত্যের পরত যেমন এই নাটকে রয়েছে, তেমনি রয়েছে অনেকগুলি সম্পর্কের টানাপোড়েনের। বিশু-নন্দিনী, কিশোর-নন্দিনী, অধ্যাপক-নন্দিনী এই সম্পর্কগুলির মধ্যে সেই অর্থে কোনো রহস্য নেই। রঞ্জন-নন্দিনীর সম্পর্কও সূর্যের আলোর মতো স্পষ্ট ও পরিষ্কার। কিন্তু যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছোয় না, সেই রাজার ঘরে, আলো আঁধারির মধ্যে, আবছায়া বা অন্ধকারের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে রাজার সঙ্গে নন্দিনীর — রহস্য তো সেইখানে। এইখানে এসে একবার নাট্যকারের একটি বক্তব্যকে স্মরণ করা দরকার, রক্তকরবীর প্রস্তাবনায় তিনি বলেছেন — "এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি।" শুধুমাত্র কথাটি নয়, এখানে কথাটি বলার ভঙ্গীটিও নজর করবার মতো। প্রায় নির্দেশই তো দিচ্ছেন এখানে নাট্যকার। এইটা মনে রাখুন সবাই। আর সব কিছু ভুলে যান — প্রায় এই ধরনেরই একটা কথা বলা হয়েছে তো এখানে। তা সে মানবীটির আচরণ তো বেশ গোলমেলে! সবাইকেই সে প্রশ্রয় দিয়ে বেড়ায়। সুন্দরীপনা করে মুগ্ধ করে রাখে নানা বয়সের পুরুষদের, এমনকি যে ভয়ঙ্কর মকররাজাকে সবাই ভয় করে, আতঙ্কিত থাকে, যে রাজা তাকে রঞ্জনের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে জোর করে তার ঘরে ঢুকে পড়ে নন্দিনী তাকে জানতে চায়। রাজাকে যে দেখা যায় না, সে যে আলোয় প্রকাশ্য নয়, সে যে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী, কখনো কখনো নন্দিনীকে সে যে ভয়ও দেখাতে চায় — এসব কিছুই কি রাজার প্রতি নন্দিনীকে কৌতূহলী করে তোলে? কিন্তু এখানেই তো সব নয়, নন্দিনী তো রাজাকে তার চুলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে আদর করতেও দেয়! দেয় হাতে হাত বুলোতে? যে রাজা তাকে রঞ্জনের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সেই রাজার সঙ্গে এ তার কেমন সম্পর্ক? এমন কি এই নাটকে রাজা নন্দিনী নামটিকেও বিভিন্ন ভাবে উচ্চারণ করেছে। কখনো ডেকেছে 'নন্দা' বলে কখনো ডেকেছে 'নন্দিন' বলে। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে প্রকৃত নামকে যখন কেউ একটু বদলে, একটু নিজের মতো করে উচ্চারণ করে, তখন যে ডাকছে আর যাকে ডাকছে তাদের দুজনের মধ্যে যে একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, আর সে সম্পর্কে যে ভালবাসার ছোঁয়া অবশ্যই আছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। নন্দিনী কখনো কখনো অযাচিতভাবেই বন্ধ দরজায় ঘা দিয়ে রাজাকে জাগিয়ে (নাচিয়ে!) তুলতে চেয়েছে। রাজা সবসময় যে উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিয়েছে তাও নয়, কিন্তু সেখানে আবার নন্দিনী জোর করে তার কথা শুনতে বাধ্য করেছে — "নন্দা, শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও নয়।

নন্দিনী — আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে। সেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই।" পরিবর্তে রাজা বলেছে "না, ঘরের মধ্যে না, যা বলার হয় বাইরে থেকে বলো।" ... নন্দিনী যে খুশি নিয়ে রাজার ঘরে যেতে চাইছে সেখানে কিন্তু রাজা বাধা দিচ্ছে। সাগ্রহে ডেকে নিচ্ছে না তাকে। নন্দিনী এদিকে কুঁদ ফুলের মালা গেঁথে এনেছে রাজার জন্য। নন্দিনী স্বীকারও করেছে রাজার অদ্ভুত শক্তি দেখে সে আশ্চর্য হয়। তবে এ কথাও ঠিক যক্ষপুরীতে সবাই রাজাকে এড়িয়ে চলে, ভয় পায়, একমাত্র নন্দিনী তাকে ভয় পায় না। বলা যায় দুজনের মধ্যে Love and hate relationship ধরা পড়েছে বারবার। যে রাজা প্রথমে নন্দিনীকে তাড়িয়েই দিচ্ছিল ধমক দিয়ে, সেই কেমন কাঙালের মতো জিজ্ঞেস করে – "আচ্ছা নন্দিনী, আমাকে কী মনে কর, খুলে বলো তো।" যেন নন্দিনী কী মনে করছে তার ওপর রাজার অনেককিছু নির্ভর করছে। রাজার এমন আচরণ আমাদের ধন্দে ফেলে? কোথায় রাজার সেই ভয়াল ভয়ঙ্কর রূপ? আর নন্দিনী যা বলে তাতে সেই ধন্ধ আরো বাড়ে বই কমে না – "কতবার বলেছি। তোমাকে মনে করি আশ্চর্য। প্রকাণ্ড হাতে প্রচণ্ড জোর ফুলে ফুলে উঠছে, ঝড়ের আগেকার মেঘের মতো – দেখে আমার মন নাচে।" – আশ্চর্যই লাগে তো, আরো আশ্চর্য লাগে যখন রাজা রঞ্জনের জন্য যেমন নন্দিনীর মন নাচে, তেমনই রাজার জন্য নাচে কিনা জানতে চায়। নন্দিনী তার সহজ প্রকাশভঙ্গিতে

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 43*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 352 - 363*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

অনায়াসে জানায় যে সে নাচের তাল আলাদা। আলোচক শাওন নন্দী রাজা ও নন্দিনীর এই সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন –

> "রাজার একলা বেঁচে থাকায়, মরু প্রতিম শুষ্ক জীবনে নন্দিনী একফালি মরুদ্যানের মতো। রাজার পরম কাঙ্ক্ষিত এক খণ্ড তৃণ। কিন্তু রাজা তাকে জোর করে পেতে চায় না। লঘু কোনও পন্থায় পেতে চায় না। সে নন্দিনীকে তার রাজত্বে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু সহজে ঘরে প্রবেশ করতে দিতে চায় না। সে নন্দিনীকে বুঝতে চায়। নন্দিনীর প্রেম তার কাছে রহস্য হয়ে থেকে যায়। নন্দিনী ও কি কিছুটা ইচ্ছা করেই সেই রহস্য জিইয়ে রাখতে চায় রাজার মনে?"[৬]

আসলে নারী মনের স্বাভাবিক চলনই হল একটু রহস্যের আবডাল রেখে চলা। নন্দিনীকে ও তার আচরণকে আপাত সহজ সরল বলে মনে হলেও সে যে যথেষ্ট রহস্যময়ী তা বোঝা কঠিন নয়। যক্ষপুরীতে তার আসল কাজটি ঠিক কি সেটাই বোঝা যায় না। সুন্দরীপনা করে বেড়ানোর তলায় তলায় তার যেন আরো গভীর, গুহ্য কোনো কাজ আছে। রাজা যখন নন্দিনীর চুলে হাত ডুবিয়ে বসে থাকে তখন তার ভালোই লাগে। আরো ভালো লাগে রাজাকে খুশি হতে দেখে। কিন্তু তারপরেই রাজা যখন রঞ্জনের প্রতি নন্দিনীর ভালবাসায় জোর কেমন, রকম কেমন তা জানতে চায়, তখন মাথা উঁচু করে নির্ভয়ে সেই অমিত শক্তিধর রাজার সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় সে জানিয়ে দিতে পারে রঞ্জনের জন্য সে মরতেও পারে। এই রসায়নটি আবার রাজা বুঝতে পারে না। বুঝতে চায় বারবার নন্দিনী রঞ্জনকে যেভাবে ভালোবাসে সেইভাবেই রাজাকে ভালোবাসে কিনা? এইসব কথার সাথে সিস্টেমের ভারে অসহায়, ক্লান্ত, অতৃপ্ত এক শক্তিশালী ব্যক্তিকেই কি খুঁজে পাই না আমরা! সে একই সঙ্গে তার এতদিনের অভ্যাসবশত চায় নন্দিনী তাকে ভয় করুক, আবার নন্দিনী ও রঞ্জনের ভালবাসার কথা শুনে সে একইসঙ্গে চায় নন্দিনীর স্বপ্রাণতার স্পর্শ, তার প্রেমময় ঐকান্তিকতা। দীর্ঘদিনের ভয়ালরূপের ইমেজটাকে বহন করতে করতে সে শ্রান্ত। কিন্তু তাকে সহজে ভেঙে ফেলবার শক্তিও তার নেই। মনে সহজ স্বাভাবিক হয়ে ওঠার ইচ্ছেটা থাকলেও তাকে গ্রহণ করবার মতো সাহস বা অন্তরের শক্তি বোধহয় তার নেই। তাহলে এতদিনের সযত্নে লালিত পুরো সাম্রাজ্যটাই ধ্বংস হয়ে যাবে; বলা ভাল রাজাকে ঘিরে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে সর্দার ও মোড়লদের এই ক্ষমতার আস্ফালন সব যাবে তলিয়ে। কাজেই রাজা নিজেই দ্বিধান্বিত। আর এই দ্বিধার জায়গাটাকেই কাজে লাগায় নন্দিনী। সে ইচ্ছে করেই রঞ্জনের জয়গান করে রাজার সামনে। রঞ্জনকে সে কতটা ভালবাসে রাজাকে দেখায়। আবার রাজাকে প্রশ্রয়ও দেয়। দেয় তাকে স্পর্শ করে সুখ পেতে। রাজা যখন 'নন্দিনী' নাম ছাড়াও তাকে 'নন্দা', 'নন্দিন' – এই সব নামে ডাকে তখন তা সে অতি সহজভাবেই গ্রহণ করে। রঞ্জনের প্রতি ঈর্ষা বা তাকে ধ্বংস করে দেবার ভয় দেখালে তার প্রতিবাদ করে সহজভাবেই। কিন্তু কোথাও রাজার প্রতি তার ক্রোধ বা ক্ষোভ বা ভয় কাজ করে না। নারীসুলভ নিরাপত্তাহীনতায় তাকে ভুগতে দেখা যায় না। এত বিশ্বাস তার রাজার প্রতি!

নাটকের শেষ পর্যায়ে এসে দেখা যায় সর্দারদের বিশ্বাসঘাতকতায় নিজের অজান্তেই রাজা রঞ্জনকে হত্যা করে। নন্দিনী চারিদিকে খুঁজে রাজার ঘরে এসে দেখে রঞ্জন মৃত। তখন রাজা জানতে পারে সে ঠকে গেছে। রঞ্জনকে সে না চিনে হত্যা করেছে। তারই সিস্টেম তাকে আর মানছে না। তখন সে ভেঙে ফেলে ধ্বজা। নন্দিনীর সঙ্গে পথে বের হয়ে পড়ে নিজেরই তৈরি করা এই ভয়াল গ্রহণ লাগা পুরী — যক্ষপুরীকে ধ্বংস করবার কাজে। নন্দিনীর আচরণ এখানে লক্ষ্য করবার মত। সারাটাক্ষণ যার পথ চেয়ে সে বসে রইল, তার প্রাণপ্রিয় রঞ্জন আজ মৃত, তখন সে তারই আরব্ধ কাজকে সম্পূর্ণ করেত রাজাকে করে নিজের সাথী। কিশোর নন্দিনীকে কথা দিয়েছিল একদিন তার জন্য প্রাণ দেবে। সেই কথা সত্যি করে দিয়ে গেল সে নন্দিনীর জন্য। আর অধ্যাপক? সে এই ভাঙনের খেলায় আর নিজের পাণ্ডিত্যের জালে আটকে থাকতে পারল না। ঈশানীপাড়ার নন্দিনী যক্ষপুরীতে এসে যে তার গায়েও হাওয়া লাগিয়েছিল। সে তাই অধ্যাপকের পাণ্ডিত্যের ধরাচূড়া নামিয়ে রেখে পথে নেমে আসে সাধারণের সঙ্গে সাধারণ হয়ে ভাঙনের, বিপ্লবের পথে অগ্রসর হবার জন্য। বিশু পাগল চিরকালই নন্দিনীতে মজেছিল, এতদিন যক্ষপুরীতে নন্দিনীর জন্য সে গান গেয়েছে, পাশে থেকেছে, আজ

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 352 - 363
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যখন রাজাকে সঙ্গে নিয়ে নন্দিনী এগিয়ে গেছে বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে, তখন ভাঙনের জয়গান গেয়ে, তার হাতের অভিজ্ঞান রক্তকরবীর কঙ্কন তুলে নিয়ে বিশুর সেই পথে না গিয়ে কোনোই উপায় নেই। নন্দিনী আর বিশুর মত ও পথ আলাদা হতেই পারে না।

নাটকের পরিসমাপ্তি হয়। ভাবনার তো হয় না। রঞ্জন আর রাজার কথা বারবার নাটকে এসেছে। রঞ্জনকে নাটকের শেষ পর্যায়ে এসে দেখা গেছে মৃত। রাজা নেপথ্যে থেকেছে। শোনা গেছে গলার স্বর। বোঝানো হয়েছে তার ভয়ঙ্কর রূপ। একেবারে শেষে এসে সে নন্দিনীর সঙ্গে বের হয়েছে পথে নিজেরই বন্দীশালা ভাঙতে। চকিতে আমাদের মনে পড়ে যায় জনপ্রিয় একটি সিনেমার দৃশ্যের কথা যেখানে রাজা নিজেই নিজের মূর্তি ভেঙে ফেলতে দড়ি ধরে টান দিচ্ছে আর বলছে — “দড়ি ধরে মারো টান / রাজা হবে খান খান।” – সেখানে তাকে এই কাজটি করতে সাহায্য করেছিল বাইরে থেকে আসা দুজন ব্যক্তি। আর যক্ষপুরীর মকররাজাকে নিজের সৃষ্ট সাম্রাজ্য ভাঙতে সাহায্য করেছে নন্দিনী। এটাই তার কাজ। যন্ত্র সভ্যতার যান্ত্রিক অনুশাসন ভাঙতে নন্দিনী এগিয়ে এসেছে। সে ছাড়া আর কেউ এই কাজ করতে পারত না।

এতক্ষণে আমরা বোধহয় সিদ্ধান্তে উপনীত হবার মতো জায়গায় পৌঁছতে পারছি। হ্যাঁ এটাই নন্দিনীর একমাত্র কাজ ছিল। রক্তকরবীর মালা গাঁথা তার কাজ নয়, কাজের উপসর্গ মাত্র। নন্দিনীর উদ্দেশ্য ছিল যক্ষপুরীর ভয়ের পাঁচিল, অমানবিকতার পাঁচিল ও শোষণের পাঁচিলকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া। আর তার জন্য সে অনেকদিন ধরে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। যাকে যাকে দিয়ে যে কাজ করানো যেতে পারে তাকে সেই কাজের জন্য গড়ে পিঠে নিয়েছে। চিরকালই নন্দিনী মনোহারিণী ছিল, তার নিজের ঈশানীগ্রামের ছেলের দলও ছিল তার প্রতি অনুরক্ত। রঞ্জন আর বিশু তো ছিলই অন্যতম দুজন হিসেবে। এই ভালোবাসার উপাচার নন্দিনী ভালোমতোই উপভোগ করত। এই অবধি সব ঠিকই আছে। বেঠিক যেখানটায় সেটা হল সেইরকম একজন নারীকে যক্ষপুরীতে আনা হল কেন? নাটকের সূত্রেই আমরা জানতে পারি যে রাজাই এনেছে নন্দিনীকে। আশ্চর্য লাগে বৈকি! কিন্তু এমন কি হতে পারে না যে রাজা নন্দিনীকে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনেক পরিকল্পনা করেই এনেছিল! কেননা সে নিজেই অস্থির হয়ে উঠেছিল এই কঠিন নির্মম সিস্টেমের মধ্যে থেকে। অস্থির হয়ে উঠেছিল নিজের ভয়ানক ইমেজটার চাপে। অথচ তার ক্ষমতা ছিল না একে ভেঙে ফেলবার। এইজন্য রাজার দরকার ছিল অনেকগুলো ‘জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন’ মানুষ। কিন্তু সেই মানুষগুলোকে সে খুঁজে পাবে কী করে? প্রস্তুত-ই বা করবে কী করে? তাই সে ছিনিয়ে আনলো নন্দিনীকে। আর সেই কারণেই আনল না রঞ্জনকে। নন্দিনীর মধ্যে আছে ভালবাসার কুহকিনী মায়া। রঞ্জনের আছে জোর। নন্দিনী কিন্তু রঞ্জনেরই ভাবনায় দীক্ষিত। রঞ্জনের সত্যে ও মন্ত্রে বিশ্বাসী। কিন্তু নন্দিনীর আছে মায়াময় আকর্ষণী শক্তি। যে শক্তি দিয়ে সে সবাইকে বশ করতে পারে। আছে সহজ সাবলীল প্রাণোচ্ছ্বাস। যা দিয়ে যক্ষপুরীতে সে এনে দেয় এক অন্যরকম হাওয়া। ধীরে ধীরে সে তার জাল বিস্তার করে। কিশোরকে দিয়ে ফুল আনায়, রক্তকরবী। রক্তকরবীর সাজে সে সজ্জিত হয়। কিশোরের আবেগকে সে কাজে লাগায়। পরাধীন ভারতবর্ষে এমন অনেক কিশোরের আবেগকে কাজে লাগানো হয়েছিল বিপ্লবের কাজে। প্রস্তুত করে কিশোরকে। নন্দিনীর দিক থেকে এতটুকু প্রশ্রয় পেয়ে কিশোর উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। প্রাণ বাজি ধরতে সে একপায়ে খাড়া। এইরকম সৈনিকই তো চাই। নন্দিনী এইভাবে সৈনিক তৈরি করে। অধ্যাপক আবার এক বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধি। ‘বুদ্ধিজীবী’ শ্রেণির এই বিশেষ ব্যক্তিটিকে ঠিক যেভাবে কাছে টানার দরকার ঠিক সেভাবেই নন্দিনী তার মুগ্ধতাকে কাজে লাগিয়েছে। অধ্যাপক তার জ্ঞানের শুষ্ক সাম্রাজ্যের মাঝে হঠাৎ করে নন্দিনীর মতো পাল্টা হাওয়ার সন্ধান পেয়ে রহস্য ভেদ করবার মতো করে মিশতে চেয়েছে। অবশ্যই সব রকমের সাবধানতা মেনে। সে যে অধ্যাপক তার গরিমা এত সহজে তো ভোলবার নয়। সেই কারণেই তার সঙ্গে নন্দিনীর ব্যবহার আলাদা। তাছাড়া এখানে প্রেম একপাক্ষিক। ‘বিশু’ একমাত্র নন্দিনীর পূর্বপরিচিত। তার ভেতরে আগুন ছিলই। প্রেমের আগুনও ছিল ছাইচাপা হয়ে। নন্দিনী তার ভেতরের সেই আগুনকে উসকে দিয়েছে যক্ষপুরীতে এসে। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন স্তরে নন্দিনী তার সৈন্যদল প্রস্তুত করেছে। ফাগুলাল যে কি না সমাজের তথাকথিত তৃণমূল স্তরের কর্মী, সেও তো নন্দিনীকে একটু বিশেষ চোখেই দেখে। বিশ্বাস করে যক্ষপুরীতে এই মেয়েটি

একেবারেই আলাদা আর সেই জন্যেই নিজের দিকে তাকিয়ে তার লজ্জা করে। অর্থাৎ আত্মবিশ্লেষণের জায়গাটায় নিয়ে যেতে পেরেছে নন্দিনী। কি করছি এখানে, এইভাবে বেঁচে থেকে? গতানুগতিক শোষণের জীবন যাপন করে, মদের নেশায় ডুবে থেকে — কি করছি আমি! – নন্দিনী বিবেকের কাজ করেছে এই স্তরের মানুষদের কাছে — এও তো প্রস্তুতি। যখন শেষ দৃশ্যে নন্দিনী ছুটে গেছে 'জয় রঞ্জনের জয়' বলতে বলতে ভাঙনের পথে; তখন এইসব সৈনিকেরাও তো যোগ দিয়েছে, এরাই তো নন্দিনীর নিজের হাতে তৈরি করা সেনাদল। আর রাজা! যে কিনা ভয়াল ভয়ঙ্করের মুখোশ পরে থাকতে বাধ্য হয়েছে, নিজেরই শাসন যন্ত্রের চাপে, তাকে তার প্রাচীন আঁধার ঘরের আগল ভাঙতে সাহায্য তো করেছে নন্দিনীই। যদিও শেষ পর্যন্ত রঞ্জনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু নন্দিনী তো রঞ্জনের দিয়ে যাওয়া মন্ত্রেই পালাবদলের গানকে কণ্ঠে তুলেছে, এমনকি তাকে বাস্তবায়িত করে তুলতে সফলও হয়েছে। আচ্ছা এখনো কি আমাদের মনে সন্দেহ থাকতে পারে যে কেন নন্দিনীকে আনা হয়েছিল যক্ষপুরীতে? আমরা তো জানিই যে রাজা এনেছিল তাকে রঞ্জনের থেকে ছিনিয়ে। মনে হয় না কি যে এটা রাজারই পরিকল্পনা। রাজাই নিজের শাসনযন্ত্রের নিষ্পেষণে এই ষড়যন্ত্র করতে বাধ্য হয়েছে। নিজের বন্দিশালা ভেঙে ফেলবার সামর্থ্য তার ছিল না। লোকবল বা জনপ্রিয়তা তার নেই। তার ছিল বানিয়ে তোলা ভয়। সেই দিয়ে শাসন হয়, খনি থেকে তাল তাল সোনা তোলা যায়, নির্মম শাস্তির মুখে ফেলা যায়, কিন্তু বিপ্লব আনা যায় না। তার জন্য দরকার স্বতঃস্ফূর্ততা, আবেগ, ভালবাসা, রোমান্টিকতা। দরকার প্রাণবাজী রাখতে পারার মত যৌবনের দূত — যাদের তৈরি করতে পারবে নন্দিনীর মতো মোহ বিস্তারকারী নারী। যে নির্লোভ, নিজে রঞ্জনের মন্ত্রে দীক্ষিত। যে ভালবেসে, মায়া বিস্তার করে, তৈরি করে নেবে বিপ্লবের জন্য যারা আত্মবলিদান দেবে তাদের। রাজা নিজে যাদের তৈরি করেছে তারা সর্দার, মোড়ল। তারা আবার এখন ক্ষমতার প্রাবল্যে রাজাকেই পরিচালনা করে। নন্দিনী তৈরি করেছে এই যক্ষপুরীতেই কিশোর, বিশু, অধ্যাপক ও ফাগুলালদের, যারা নন্দিনীর ইশারায় সমস্ত কিছু ছেড়ে একডাকে পথে নামতে পারে; পাবে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাজ বদলে দেবার লড়াই করতে। তার জন্যই নন্দিনীকে দরকার ছিল। রাজার যা ইচ্ছা ছিল, রাজা যা পারেনি নন্দিনীকে দিয়ে সেটা সে করিয়েছে। রঞ্জনকে দিয়ে এ কাজ হত না। রঞ্জন সোজা মানুষ, গায়ের জোর ও মনের জোরে সে রাজার সাম্রাজ্যের দখল নিতে চাইত। সামনা সামনি লড়াই-এ কেউ এই শাসনযন্ত্রের যান্ত্রিক সিস্টেমের সঙ্গে পারত না। তার জন্য দরকার ছিল দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি। দরকার ছিল নারীর মায়াজাল বিস্তারের। আর তাই করেছে নন্দিনী। সবার সাথে রঙ মিলিয়ে যে নিজের মনের রঙে রাঙিয়েছে তার সৈন্যদলকে। কাজেই রাজার উদ্দেশ্য সফল। তার নিজের বেড়াজাল ভেঙে বের হয়ে আসার জন্য দরকার ছিল নন্দিনীর।

সেই মতো নন্দিনীকে সে যক্ষপুরীতে স্থাপন করেছে। সফল নন্দিনীও, রঞ্জনের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তার আরাব্ধ কাজ হাতে তুলে নিয়েছে সে। যক্ষপুরীতে তুলেছে নাচের ছন্দ। সকলের মনে মাতন ধরিয়ে পথে নামিয়েছে সে। কাজেই নন্দা, নন্দিন বা নন্দিনী সহজ মেয়ে মোটেই নয়, তাকে না বোঝা সহজ, না তার কাজটা সহজ। সবার ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে সে। প্রকৃত অর্থেই তাই সে ঘুমভাঙানিয়া।

## Reference:

১. রক্ষিত, মলয়, 'রক্তকরবীর নেপথ্যলোক : তথ্য থেকে সত্যের সন্ধানে', রক্তকরবী : পাঠ ও পাঠান্তরের ভাবনায়, দে'জ পাবলিশিং, পুণর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ৫৮

২. নন্দী, শাওন, প্রসঙ্গ নন্দিনী : অনুসঙ্গ 'রক্তকরবী', সম্বিৎসা, সাহিত্য-সংস্কৃতির ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ১৫ই আগষ্ট ২০২৪, পৃ. ১২৯

৩. মিত্র, শম্ভু, নাটক রক্তকরবী, এস. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ সংস্করণ, আগষ্ট, ২০১৫, পৃ. ২০

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 43*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 352 - 363*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

৪. মুখোপাধ্যায়, তরুণ, রক্তকরবী : প্রেমের মাত্রা, কালের বার্তা। ‘রক্তকরবী : অন্য বিবেচনা’, এস. এস. পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ২৫ এপ্রিস ২০১৪, পৃ. ১৩

৫. রক্ষিত, মলয়, ‘চরিত্রের বিবর্তন’, রক্তকরবী : পাঠ ও পাঠান্তরের ভাবনায়, দে’জ পাবলিসিং, পুণর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ১০৭

৬. নন্দী, শাওন, প্রসঙ্গ নন্দিনী : অনুসঙ্গ ‘রক্তকরবী’, সন্বিৎসা, সাহিত্য-সংস্কৃতির ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ১৫ই আগষ্ট ২০২৪, পৃ. ১৩৩